কালের কণ্ঠ
তারিখ ... 30 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১৪ কলাম ...২ ...

মিল্টন বিশ্বাস

প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাশিত ছাত্ররাজনীতি

ছাত্রলীগের ২৮তম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ছাত্ররাজনীতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৭ জুলাই গণভবনে নতুন নির্বাচিত ছাত্রলীগের কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় করার সময়ও তিনি একই মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তিনি ছাত্রলীগের ভাবমূর্তি রক্ষার কথা বলতে গিয়ে রাজনীতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিতে বলেছেন। তাঁর মতে, ত্যাগ ছাড়া প্রকৃত নেতৃত্ব গড়ে ওঠে না। যারা ভোগের রাজনীতি করে তারা দেশকে কিছুই দিতে পারে না। ছাত্রলীগ জাতির সব অর্জন ও উন্নয়নের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। এই সংগঠনের ইতিহাস বাঙালির ইতিহাসের সঙ্গেও জড়িত। '৪৩ মিনিটের বক্তব্যের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ এবং সব গণতান্ত্রিক ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ছাত্রলীগ এবং এই সংগঠনের নেতাকর্মীদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তাঁর মতে, আজ যারা ছাত্রলীগের নেতৃত্বে তারাই একদিন জাতির চালিকাশক্তি হবে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আসবে। স্বাধীনতাপূর্ব বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রলীগকর্মী হিসেবে শেখ হাসিনা নিজের রাজনীতিসংশ্লিষ্টতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন সবাইকে। উল্লেখ্য, ছাত্ররাজনীতি নিয়ে তাঁর গঠনমূলক ভাবনা ও ছাত্রদের কাছে শুভ প্রত্যাশা অনেক দিনের।

শেখ হাসিনা তাঁর একটি প্রবন্ধে ছাত্ররাজনীতির মূল লক্ষ্য সম্পর্কে লিখেছেন, 'ছাত্ররাজনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বদানে নিজেকে গড়ে তোলা।' (শেখ হাসিনা রচনাসমগ্র ১, পৃ. ১৭৯) এ জন্য তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার উপযুক্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলেন ১৯৯৪ সালে। তিনি আরো লিখেছেন, 'আমরা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের বিরোধী।' বর্তমান শতাব্দীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ নির্মাণে নতুন প্রজন্মের সাহসী সৈনিকরা অনেকেই নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছেন। আর জননেত্রী শেখ হাসিনার যুগোপযোগী নেতৃত্বের কারণে দেশ এগিয়ে চলেছে। গত ২৪ নভেম্বর কারো মুখের দিকে না তাকিয়ে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসে জড়িতদের বিরুদ্ধে 'যথাযথ ব্যবস্থা' নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। সেদিন শেখ হাসিনা বলেন, 'এখানে একটা নির্দেশ আমি দিতে চাই, যারাই এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করবে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস করবে, যে দলের হোক, কে কোন দলের সেটা দেখার কথা নয়, যারা এ ধরনের কর্মকাণ্ড করবে সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে হবে।' অবশ্য তখন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে বলা হয়েছিল, 'শাহজালালে সংঘর্ষের দায় ছাত্রলীগের নয়'। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি জানি যে যারাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণ্ডগোল করুক, একটা পর্যায়ে দেখা গেছে, সেখানে ছাত্রের চেয়ে অছাত্র বেশি, কিছু বহিরাগত, তারাও এর সঙ্গে জড়িত থাকে।' তাঁর মতে, দোষীদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার ও উপযুক্ত শাস্তি দিলে এসব ঘটনা 'নিয়ন্ত্রণ' করা যায়। প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের কাছে অনেক বেশি প্রত্যাশা করেন বলেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২০০৮ সালের নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের কথা তাঁর মনে ছিল, এ জন্য ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের আগে তিনি 'এগিয়ে যাচ্ছে দেশ' ইশতেহারটিও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা তরুণদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর প্রত্যাশার ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন স্বপ্ন নয়, বাস্তব।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের অনেক অন্তরায়ের মধ্যে একটি হলো নোংরা ছাত্ররাজনীতি। অভিযোগ রয়েছে, বর্তমান ছাত্রসংগঠনগুলোর নেতৃত্ব ছাত্রদের ন্যায্য দাবি-দাওয়াসহ জাতীয় ইস্যুতে সোচ্চার হওয়ার চেয়ে নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত। এই প্রবণতা থেকে ছাত্রদের মুক্ত করতে পারে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার। জননেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের একজন নেত্রী হিসেবে পাকিস্তান আমলে 'ছাত্রী সংসদ' নির্বাচনে ভিপি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর মেয়ে হিসেবে নয়, সে সময় তাঁর মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সাধারণ ছাত্রীদের মন জয় করে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এটি ছিল আদর্শের জয়। এই আদর্শভিত্তিক সংগঠন ছাত্রদের পথপ্রদর্শক হতে পারে।

অবশ্য দুই দশক আগে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ছাত্রদের দিয়ে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার চিন্তা করেছেন। ১৯৯৪ সালে তাঁর লিখিত 'শিক্ষিত জনশক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবমুখী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। দেশের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। প্রতিটি ছাত্র যাতে তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক মেধা, মনন, ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী পেশা বেছে নিতে পারে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা তাঁর অন্তরের চাওয়া ছিল। সে সময় তাঁর প্রত্যয়দৃপ্ত উচ্চারণ হলো, 'শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে আমরা বদ্ধপরিকর।' আগেই বলা হয়েছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা বিরাজ করলে তা প্রতিবিধানে তিনি সব সময়ই উদ্যমী ভূমিকা পালন করেছেন। ওই প্রবন্ধে তিনি ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দিয়ে নিরক্ষরতা দূর করার কথা বলেছিলেন। ছাত্রদের কাজে লাগানোর তাঁর সেই স্বপ্ন রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর ভিন্ন আঙ্গিকে সম্পন্ন হয়েছে। উপরন্তু তিনি ফেল করা হতাশ শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভেবেছিলেন। দুই দশক আগের এসব ভাবনার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বর্তমান রাষ্ট্র পরিচালনায়। গত মহাজোট সরকারের অন্যতম কীর্তি জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন। 'শিক্ষানীতি ২০১০'-এ ছাত্রদের চরিত্র গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষানীতির 'শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য' তিন অংশে বলা হয়েছে : 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির (যেমন—ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো' হবে।

এ কথা সত্য, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে ছাত্ররাজনীতির রূপ পাল্টেছে। ২০১৫ সালের ছাত্ররাজনীতি এবং ষাট-সত্তরের দশকের ছাত্ররাজনীতি কখনোই এক নয়। কারণ মুক্তিযুদ্ধের পর ছাত্ররাজনীতি এবং বর্তমানের রাজনৈতিক বাস্তবতার রাজনীতি একেবারেই ভিন্ন। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে ছাত্রসংখ্যা এবং বর্তমানের ছাত্রসংখ্যার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে একটা স্পৃহা কাজ করত, দেশকে স্বাধীন করতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের আলাদা একটা ভূখণ্ড হবে এবং বাংলাদেশ তার আত্মপরিচয় হিসেবে জাতীয় সংগীত ও পতাকা পাবে। সর্বোপরি পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। ১৯৭১ সালে ছাত্ররা যুদ্ধ করেছে দেশের বাইরের শক্তি পাকিস্তানের সঙ্গে। কিন্তু বর্তমানে ছাত্রসংগঠনগুলো দেশের ভেতরে অর্থাৎ ঘরের ভেতরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ভেতর এমন কতগুলো সংগঠন রয়েছে যারা বাঙালি এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে না এবং যারা ধারণ করে তাদের দমন করার চেষ্টা করে। বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের চিন্তা-চেতনা হলো কিভাবে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধিশালী এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা যায়। আওয়ামী লীগ সরকারের চিন্তা-চেতনা ও কর্মসূচির সঙ্গে ছাত্রলীগের চিন্তা-চেতনার একটা গভীর মিল রয়েছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সরকারের এই কর্মসূচিকে সমর্থন করে এবং এর সফলতার জন্য কাজ করে। অন্যদিকে ছাত্রলীগ শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করে। তাই ছাত্রলীগের প্রধান মন্ত্র হলো শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিচালনা করা।

একবিংশ শতাব্দীর ছাত্রদের এই স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার পেছনে রয়েছে বিংশ শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী ছাত্ররাজনীতির প্রাণিত ইতিহাস। বিংশ শতাব্দী ছিল বিশ্বব্যাপী ছাত্ররাজনীতির অঢেল অর্জন আর অধিকার আদায়ের স্মরণীয় যুগ। এ কারণে এই একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে ওই শতাব্দীর শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ যোগ্যতা ও মেধার মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করার বিষয়টি আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। কেবল রাজনীতি নয়—পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজ পরিবর্তনের নানা ক্ষেত্রে তারা পাঠ্যসূচির বাইরে অবদান রেখেছে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণে ছাত্রদের এই ধরনের ভূমিকার কথাই বলেন শেখ হাসিনা। অন্যদিকে ছাত্ররাজনীতির দরকার এই কারণে যে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মোকাবিলা করতে বারবারই আমাদের সতর্ক থাকতে হচ্ছে। কোটি কোটি টাকার অর্থ-সম্পদের মালিক জামায়াতে ইসলামী আর তাদের যুদ্ধাপরাধী নেতারা এই দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চাননি, বরং একাত্তর প্রসঙ্গে ধারাবাহিক মিথ্যাচার করে গেছেন নানা সময়ে। দেশ পরিচালিত হবে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের ছাত্রসমাজ দ্বারা। কাজেই ছাত্রদের রাজনীতির সুস্থ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। তবেই দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
writermiltonbiswas@gmail.com